জঙ্গিদের আত্মঘাতী বোমা হামলা আর ভাবমূর্তির ষোলকলা

অভিজিৎ রায়

ডিসেম্বর ২, ২০০৫

এবারে তাহলে ষোলকলা পূর্ণ হয়ে গেল, দেশের 'ভাবমূর্তি'র ষোলকলা। ভাব বাবু তো আগেই গিয়েছিলেন, 'মূর্তি' মামাও যাই যাই করছিলেন। দু'মাস আগে দেশের প্রায় সব ক'টি জেলায় জে.এম.বি বাহিনীর একযোগে বোমা মহড়ার 'মামুলি চাপরের' পর পরই অনুমান করা হচ্ছিল এবার সামনে বড় কোন বিপদ আসছে। বুঝতে পারছিলাম যে, সামনের বিপদটা কেবল মহড়া আর লিফলেট বিলির মত 'মামুলি চাপরে' সীমাবদ্ধ রইবে না। মাত্র দিন কয়েকের ব্যবধানে দু'জন বিচারক হত্যা আর তারপর গাজীপুর আর চট্টগ্রাম আদালতে 'বুজুর্গ জঙ্গীদের' আত্মঘাতী হামলার পর আজ আর বোধ হয় কারো সন্দেহ থাকার কথা নয় যে বাংলাদেশ জিয়াউল হকের পাকিস্তান আর তালিবানদের আফগানিস্তানের মত পূন্যভুমিতে পরিণত হয়ে গেছে; ঘটে গেছে বঙ্গোপসাগরে মূর্তি মামা'র সলিল সমাধি। ত্রিশ লক্ষ শহীদের রক্তে অর্জিত 'সেক্যুলার' আর 'মডারেট' বলে কথিত বাংলাদেশের স্বাধীনতাপ্রাপ্তির চৌত্রিশ বছর পেরোতে না পেরোতেই ক্ষমতালিপ্সু আপরিনামদর্শী রাজনীতিবিদদের হাতে কি করুণ, মর্মান্তিক পরিণতি। বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের উপর অত্যাচার, প্রগতিশীল লেখক সাহিত্যিকদের উপর নিপীড়ন, মৌলবাদীদের আগ্রাসন, এর ক্রমবৃদ্ধি এগুলো নিয়ে তো প্রশ্ন ছিলোই, এবারে 'সুইসাইড বোম্বিং' এর তেতো স্বাদও আমাদের গ্রহণ করতে হল, যা আমাদের সংস্কৃতিতে আগে কখনই ছিলো না। সত্যই 'বড় বিস্ময় লাগে'! ডঃ হুমায়ুন আজাদের মতই স্বগতোক্তি করতে হয় - '**আমরা কি এই বাংলাদেশ চেয়েছিলাম**'? :

> যখন আমরা বসি মুখোমুখি, আমাদের দশটি আঙুল হৃৎপিন্ডের মতো কাঁপতে থাকে
> দশটি আঙুলে, আমাদের ঠোঁটের গোলাপ ভিজে ওঠে আরক্ত শিশিরে,
> যখন আমরা আশ্চর্য আঙুলে জ্বলি, যখন আমরাই পরস্পরের স্বাধীন স্বদেশ,
> তখন ভুলেও কখনো আমাকে তুমি বাঙলাদেশের কথা জিজ্ঞেস করো না;
> আমি তা মূহূর্তেও সহ্য করতে পারি না, -তার অনেক কারণ রয়েছে।
>
> তোমাকে মিনতি করি কখনো আমাকে তুমি বাঙলাদেশের কথা তুলে কষ্ট দিয়ো না।
> জানতে চেয়ো না তুমি নষ্টভ্রষ্ট ছাপ্পান্নো হাজার বর্গমাইলের কথা, তার রাজনীতি,
> অর্থনীতি, ধর্ম, পাপ, মিথ্যাচার, পালে পালে মনুষ্যমন্ডলি, জীবনযাপন, হত্যা, ধর্ষণ,
> মধ্যযুগের দিকে অন্ধের মতোন যাত্রা সম্পর্কে প্রশ্ন ক'রে আমাকে পীড়ন কোরো না;
> আমি তা মুহূর্তেও সহ্য করতে পারি না, - তার অনেক কারণ রয়েছে । ...

অথচ বাংলাদেশের এই অধোগমন (অধোগমন ছাড়া আর কীই বা বলা যায় একে?) যে বোঝা যাচ্ছিলো না তা তো নয়। আলামত যা ছিলো তা খুব স্পষ্টই। এমন তো নয় যে চট্টগ্রাম আর গাজীপুরের এই সাম্প্রতিক বোমা হামলার আগে ধারাটি স্পষ্ট ছিলো না। বোঝা আসলে যাচ্ছিল অনেক আগে থেকেই। প্রাচীন ভারতের মুনি ঋষিরা নাকি ভূত-ভবিষ্যতের নানা ঘটনা সঠিকভাবে অনুমানের নানা কিসিমের রাস্তা বের করেছিলেন। যেমন, ধোঁয়া দেখে অতীত-প্রজ্জ্বলনের অনুমান, গর্ভ দেখে অতীত মৈথুনের অনুমান, আজকের সুপুরুষ্ট বীজ দেখে ভবিষ্যতের ফলবান বৃক্ষের অনুমান, ইত্যাদি। এ ধরনের নানা অনুমানের

উদাহরণ পাওয়া যায় প্রাচীন 'চারক সংহিতা'য়। মুনি-ঋষিরা কেউ অন্তর্যামী ছিলেন না । তারা সমকালীন সাদা-মাঠা ঘটনা স্রেফ নিবিড় ভাবে পর্যবেক্ষণ করেছিলেন আর ঘটনামালাকে একের পরে এক সাজিয়েছিলেন ইতিহাসের পরিক্রমায়। এগুলো করতে রকেট সায়েন্টিস্ট হতে হয় না, আইনস্টাইনের মত বিরল প্রতিভারও দরকার হয় না, যা লাগে তা খুবই সাধারণ- করোটির নীচে ধুসর বর্ণের পদার্থটুকু যাকে চলতি কথায় আমরা বলি 'ঘিলু' আর একটুখানি 'কমন সেন্স'। ও দুটারই বড় অভাব মনে হচ্ছে খালেদা-নিজামীর জামানায়! নইলে মৌলবাদের ধোঁয়া তো শুধু নয়, একেবারে প্রজ্জ্বলিত আগুন দেখেও কি কেউ 'মডারেট জাতি'র তকমা এঁটে সুখে দিবা স্বপ্ন দেখতে থাকে বছরের পর বছর? আর মৌলবাদের বীজ শুধু নয়, বাড়-বাড়ন্ত বৃক্ষ দেখেও মরীচিকা ভেবে ভুল করে?

সেই ১৯৯৯ সালের ৬ ই মার্চ উদীচীর গানের অনুষ্ঠানে যখন বোমা হামলায় মারা গেলো ১০ জন আর আহত হলো শ' খানেক লোক আর তার পরপরই যখন সিপিবির সভায় বোমা হামলা হল তখনই আঁচ টের পাওয়া গিয়েছিলো। বোঝা যাচ্ছিলো যে, রোপন করা হয়ে গেছে বিষবৃক্ষের চারাটি; এখন শুধু ফলনের অপেক্ষা।

এল ২০০১ এর ১৪ ই এপ্রিল -পয়লা বৈশাখ। রমনা বটমূলের 'বে-শরিয়তি' গান বাজনার অনুষ্ঠানকে বেছে নেওয়া হল আক্রমণের পরবর্তী নিশানা হিসেবে। সেখানেও মারা গেলো দশ জন। একজন অপরাধীও ধরা পড়ল না। এই ধারাটিকে একেবারে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়া হল নির্বাচনের পর জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে - যখন নির্বিচারে সংখ্যালঘুদের উপর নির্বিচারে অত্যাচার নিপীড়ন শুরু হল। আসলে শুধুমাত্র 'অত্যাচার' আর 'নিপীড়ন' বললে বোধ হয় ভয়াবহতার মাত্রাটা বোঝা যাবে না। নিবাচনের পরবর্তী কয়েকমাসে ঠিক কি হয়েছিল, তা বোঝা যাবে গার্ডিয়ানে প্রকাশিত জন ভাইদালের '**Rape and torture empties the villages**' (July 21, 2003) একটি প্রবন্ধ পড়ে নিলেই। প্রবন্ধটিতে অত্যন্ত মর্মস্পর্শীভাষায় বর্ণনা করা হয়েছে পূর্ণিমা রানীর মত হতভাগ্যদের উপর সে সময় কিরকমভাবে গণধর্ষনের স্টিমরোলার চালানো হয়েছিলো। শুধুমাত্র পূর্ণিমা রানীই একমাত্র শিকার নন, ভাইদালের মতে নির্বাচনোত্তর তিন মাসে ডজনকে ডজন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষকে হত্যা করা হয়েছে, অন্ততঃ এক হাজার মহিলাকে ধর্ষণ করা হয়েছে আর কয়েক হাজার লোককের জমি-জমা কেড়ে নেওয়া হয়েছে। এ ধরণের রিপোর্ট শুধু গার্ডিয়ানে বা হিন্দুস্থান টাইমসে নয়, পাশাপাশি প্রকাশিত হয়েছিল ডেইলি-স্টার, প্রথম-আলো, সংবাদ, জনকন্ঠ, ভোরের-কাগজসহ দেশের সকল শীর্ষস্থানীয় পত্রিকাগুলোতে। এমনকি মৌলবাদী আর সরকার সমর্থিত পত্রিকা ইনকিলাব আর সংগ্রামও একেবারে বাদ যায়নি। মুক্ত-মনার (www.mukto-mona.com) ঢাকা নিবাসী সদস্যরা 'নাগরিক অধিকার সংরক্ষণ ও সাম্প্রদায়িকতা প্রতিরোধ কমিটি'র ব্যানারে ভোলা জেলায় অন্নদাপ্রসাদ নামের একটি গ্রামে সরোজমিনে পর্যবেক্ষণ করতে গিয়েছিলো। তবে পর্যবেক্ষণই শুধু উদ্দেশ্য ছিলো না, সেই সাথে কর্মসূচী নেওয়া হয়েছিলো যারা সাম্প্রদায়িক নিপীড়নের শিকার হয়েছে তাদের আর্থিক ও মানসিকভাবে সহায়তা প্রদান করা। তাদের পাঠনো প্রতিবেদনে সে সময়ের যে ছবি উঠে এসেছে তা সত্যিই মর্মস্পর্শী। মুক্তমনায় প্রকাশিত ডঃ অজয় রায়ের 'Trip To Bhola: *Annada Prasad* Cries in Silence & Anguish' শিরোনামের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে অন্নদাপ্রসাদ গ্রামে ঘটনার ভয়াবহতা এমনকি একাওরের দিনগুলিকেও হার মানায় :

> 'The story is harrowing as is gradually revealed to us by those who went through these horror continued for two days. They recalled that even in the worst days of 1971 when Pakistani soldiers were committing sin against

Bengali population number of enmasse raping was very limited compared to what happened in Annada Prasad.'

নানা ঘটনা-দুর্ঘটনায় পোড় খাওয়া অভিজ্ঞজনেরা তখনই বলছিলেন, দেশে একটা নয়া মেরুকরণ শুরু হয়েছে। মুক্ত-মনার কিছু সাহসী সদস্য বিভিন্ন ফোরামে আর অন-লাইন পত্র-পত্রিকায় আরেকটু এগিয়ে গিয়ে সে সময় বলতে শুরু করেছিলেন - *'আসলে এ আলামত খুব পরিস্কার; দেশ আসলে তালিবানিজমের দিকে যাচ্ছে। দেশটাকে আবার পাকিস্তান বানানোর পায়তারা শুরু হয়ে গেছে।'* আমাদের অনেকেই সেসময় ইন্টারনেটের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় এ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি নিয়ে লেখালিখি শুরু করেছিলেন সঙ্গত কারণেই। কিন্তু লিখলে কি হবে, সরকার তখন 'দেশপ্রেমিক' উবার এলিস সেজে বসে আছে। সরকার পক্ষ থেকে বক্তব্য দেয়া হল এই বলে যে *দেশের বাইরে এক 'বাংলাদেশ বিরোধী কুচক্রী মহল' দেশের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করার অপচেষ্টায় লিপ্ত হয়েছে*। প্রধাণমন্ত্রী জনগণকে এ বিষয়ে সচেতন থাকার পরামর্শ দিয়ে বেশ কিছু জ্বালাময়ী ভাষণও দিলেন। রটিয়ে দেয়া হল যারা দেশের ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন করার অপচেষ্টায় লিপ্ত আছে তারা হয় ভারতের 'র' এর এজেন্ট, নয়ত ইহুদীদের 'মোসাদ'র আর নাহয় আমেরিকার সি.আই.এর! আর রাজা যত না বলে পারিষদ বলে তার শতগুন! তা হবে নাই বা কেন, বাংলাদেশে সবসময়ই চুলার চেয়ে তাওয়া গরম থাকে বেশী, আর থাকে সূর্যের চেয়ে বালি গরম! মওদুদ, ব্যানাহুদা, গয়েশ্বর রায়দের উপর 'সুমহান দায়িত্ব' অর্পিত হল কিভাবে দেশদ্রোহীদের তালিকা তৈরী করে দেশের হৃত ভাবমূর্তি উদ্ধার করা যায়। এমনকি 'মডারেট' সাইফুর রহমানও সংখ্যালঘুদের উপর নিপীড়ন সম্পূর্ণ অস্বীকার করে সেসময় বলেছেন :

'একটি পরাজিত দল, তথাকথিত বুদ্ধিজীবীরা সাম্প্রদায়িকতা সহ বিভিন্ন ইস্যুতে হইচই করছে'। (দৈনিক সংবাদ, ২৭/১১/২০০১)

মান্নান ভূইয়াও একই সুরে বলেন :

'একটি মহল সংখ্যালঘুদের নিয়ে যে নোংরা রাজনীতি করতে চেয়েছে জনগণ তা প্রত্যাখ্যান করেছে' (২৮/১২/২০০১)

এদের পাশাপাশি ফরহাদ মজহারের মত একশ্রেনীর 'পোষা বুদ্ধিজীবী'রা তো ছিলেনই, জল ঘোলা করতে। মজহার এক প্রতিষ্ঠিত দৈনিকে 'বাংলাদেশের জন্য খারাপ খবর' নামে একটি প্রবন্ধে বলা শুরু করলেন, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর নির্যাতন নয়, বাংলাদেশের জন্য আসল খারাপ খবর হল দেশের বাইরে কিছু মহলের দেশের সুনাম ক্ষুন্ন করার অপচেষ্টা! আর যথারীতি তিনি এই অপচেষ্টার পেছনে ভারতীয় নীল নক্সা আবিস্কার করে ফেললেন।

আন্তর্জাতিক বিশ্বেও ততদিনে মৌলবাদ, জঙ্গিবাদ আর সাম্প্রদায়িকতা থাবা বসাতে শুরু করে দিয়েছে পুরোমাত্রায়। খোদ আমেরিকায় ঘটে গেছে স্মরণকালের ভয়াবহ ঘটনা - নাইন-ইলেভেন, ২০০১ সালে। ভারতের গুজারাটেও ঘটেছে স্মরণকালের ভয়াবহ দাঙ্গা। আমাদের দেশের স্বপ্ন-বিলাসীরা আপন মনে দিবাস্বপ্নে মশগুল ছিলেন এ ভেবে যে আমাদের দেশটা হচ্ছে 'স্বপ্নপুরী' - সম্প্রীতির দেশ, আমরা হচ্ছি দেবতুল্য 'মডারেট' জাতি, আমাদের দেশে ও সমস্ত দাঙ্গা-ফ্যাসাদ-জিহাদী বোম্বিং কখনই হবে না। কিন্তু স্বপ্ন বিলাসীদের স্বপ্ন-সুখে প্রথম ব্যাঘাত ঘটল যখন বার্টিল লিনটার নামের এক সাংবাদিকের লেখা "Bangladesh: A Cocoon of Terror"'নামের একটি প্রবন্ধ *ফার ইস্টার্ণ ইকোনমিক রিভিউ*- জার্নালে

প্রকাশিত হল ২০০২ সালের এপ্রিল মাসের ৪ তারিখে। লেখক তার প্রবন্ধে খুব স্পষ্ট করেই বলেছিলেন 'আলামত যা দেখছি তাতে তো মনে হচ্ছে সেক্যুলার আর মডারেট শক্তির অবস্থা দেশে বিপন্ন। ধর্মান্ধ সাম্প্রদায়িক শক্তিকে যদি এখনই শক্ত হাতে দমন না করা যায় তো দেশের ভবিষ্যৎ সত্যই অন্ধকার'। এ কথায় কোথায় সরকারের টনক নড়বে তা নয়, সরকারী আমলা থেকে শুরু করে কলমবাজ বুদ্ধিজীবী পর্যন্ত সবাই ঝাপিয়ে পড়লেন লিন্টারের উপর। দেশের সমস্যা নিয়ে বিচলিত না হয়ে বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন লিন্টারের চরিত্র হননে - নিশ্চয়ই ব্যাটা সি.আই.এর এজেন্ট, হলুদ সাংবাদিকতা করে, বাংলাদেশ-বিদ্বেষী, তথ্য সন্ত্রাসী ইত্যাদি ইত্যাদি। বাংলাদেশের 'ভাবমূর্তি' রক্ষাকারীর ওই তালিকায় এমনকি ডেইলি স্টারের মাহফুজ আনাম থেকে শুরু করে 'নিউ এজ' এর অধুনা প্রয়াত এনায়েতুল্লাহ খান সকলেই ছিলেন। একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি দেখতে পেলাম যখন এলেক্স পেরীর তথাকথিত 'বাংলাদেশ বিরোধী' প্রবন্ধ 'Deadly Cargo' প্রকাশিত হয়েছিল নিউইয়র্ক টাইমসে - ২০০২ সালের অক্টোবর মাসের ২১ তারিখে। ভীমগর্জনে রাজনৈতিক বিশ্লেষক বুদ্ধিজীবীরা ঝাপিয়ে পড়লেন আরও একবার দেশের 'ইমেজ' রক্ষায়। ব্যতিক্রম ছিলেন এদিক ও দিক ছড়িয়ে থাকা আবেদ খান-মুন্তাসির মামুনেরা আর ইন্টারনেটের কিছু মুক্ত-মনা লেখকেরা। আমি সেসময় মুক্ত-মনায় '**যুক্তির আলোয় দেশের ভাবমুর্তি এবং দেশপ্রেম**'' নামের একটি প্রবন্ধ লিখি, বাংলায়। সে প্রবন্ধে আমি তুলে ধরেছিলাম দেশপ্রেমের যৌক্তিক সংজ্ঞা। বলেছিলাম, দেশ মানে দেশের মাটি নয়, দেশপ্রেম মানে কখনই দেশের মাটির প্রতি বা প্রাণহীন নদী-নালা আর পাহাড়-পর্বতের জন্য ভালবাসা হতে পারে না। দেশপ্রেম মানে হওয়া উচিৎ দেশের মানুষের প্রতি প্রেম; লাঞ্ছিত, বঞ্চিত অবহেলিত গণ-মানুষের প্রতি ভালবাসা। রাষ্ট্রের একটি প্রধানতম উপাদান হল জনসমষ্টি। এই জনসমষ্টিকে বাদ দিয়ে শুধু কতকগুলি প্রাণহীন নদী-নালা, খাল-বিল, পাহাড়-পর্বত আর মাটির প্রতি ভালবাসা সৃষ্টিকে আর যাই বলা হোক, 'দেশপ্রেম' বলে অভিহিত করার কোন যৌক্তিকতা নেই। উদ্ধৃতি হাজির করেছিলাম রবীন্দ্রনাথের, আইন্সটাইনের আর হাল আমলের যুক্তিবাদী প্রবীর ঘোষের; দেখিয়েছিলাম *প্যাট্রিওটিজমও* শেষ পর্যন্ত কিন্তু একটা *ডগমাই*। কিন্তু কে শোনে কার কথা! মগজ ব্যাচা বুদ্ধিজীবীদের কাছে তখন মানবিকতার চেয়ে দেশের ভাবমুর্তিটাই ছিল বড়! তারা মনে করে ছিলেন, দেশের মানুষের উপর খুন-ধর্ষণ-নিপীড়ন-নির্যাতন যাই হোক না কেন কার্পেটের নীচে তথ্য পুরে রেখে দেশকে যে কোন মূল্যে উপরে তুলে ধরে রাখার নামই হচ্ছে 'দেশপ্রেম'! যেমন, রাষ্ট্রদ্রোহিতার মামলায় শাহারিয়ার কবিরকে গ্রেফতারের কারণ হিসেবে সরকার পক্ষ থেকে বলা হয়েছিল:

> 'নিবার্চনের আগে ও পরে সংখ্যালঘুদের নিয়ে সচিত্র প্রতিবেদন তৈরী করে শাহরিয়ার কবির দেশের ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন করেছেন।' (দৈনিক জনকন্ঠ , ২৪/১১/২০০১)

অর্থাৎ, সংখ্যালঘুদের উপর অত্যাচার-নিপীড়ন, নির্যাতন এ ক্ষেত্রে দেশপ্রেমিক সরকারের কাছে অপরাধ বলে গন্য হয়নি, গন্য হয়েছে সংখ্যালঘুদের নিয়ে 'সচিত্র প্রতিবেদন' তৈরী! এ যেন আমাদের হিটলারের জামানার কথা মনে করিয়ে দেয়। হিটলারের জার্মানীর জাতীয় সঙ্গীতটি হল -'Deutschland über Alles'। এর মানে দাঁড়ায় - 'Germany Above All' (জার্মানী সবার উপরে)। কাজেই 'বাংলাদেশ উবার এলিস' সিন্ড্রোমে আক্রান্ত দেশপ্রেমিকেরাও ঠিক করলেন যে কোন মূল্যে 'বাংলাদেশ সবার উপরে' রাখতে হবে, তা যত সহস্র পূর্ণিমা রানীরাই গণধর্ষণের শিকার হোক না কেন। আমি বলেছিলাম এ ধরনের দেশপ্রেম মানুষকে 'মানবিক' না করে আসলে সংকীর্ণ করে তুলে। আর এ কথা তো জানাই যে, 'সঙ্কীর্ণ জাতিপ্রেমই স্বার্থপরতার সূত্রপাত, আর স্বার্থের সমাপ্তি অপঘাতে।' হিটলার, নেপোলিয়ন, মুসোলিনি, সাদ্দামের উদাহরণগুলো দেখলে বোঝা যায় অন্ধদেশপ্রেম আর জাতীয়তাবোধ কিভাবে একটি মানুষকে দানবে পরিণত করতে পারে। যুক্তি দিয়ে, উদাহরণ দিয়ে বোঝালাম জন্মভূমির প্রতি উদগ্র মোহ সব সময় কিন্তু ভাল কিছু নয়। মোল্লারা তো বটেই 'সেক্যুলার' বলে দাবীদার প্রগতিমনারা পর্যন্ত সেদিন মুক্ত-

মনাদের এই ধরণের ট্যাবুর বাইরের অপ্রচলিত কথাবার্তা হজম করতে পারলেন না। যথারীতি আমাদের পুরস্কৃত করা হল 'র' এর এজেন্ট, ইহুদীদের 'মোসাদ'র আর না হয় আমেরিকার সি.আই.এর এজেন্ট ইত্যকার নানা অভিধায় অভিহিত করে!

তারপর গঙ্গা-যমুনার উপর দিয়ে অনেক জল বয়ে গেছে। রূপকথার রাজপুত্রের মত রাজশাহীর বাঘমারা এলাকায় উত্থান ঘটে এক রবাহূত 'বাংলা ভাইয়ের'। গত বছর মাসের পর মাস জুড়ে 'বাংলা ভাইকে' নিয়ে সিরিজ আকারে সম্পাদকীয় লিখেছিল দেশের সকল সংবাদপত্রগুলো। বাংলা ভাইয়ের ক্যাডারদের মানুষ মেরে গাছে ঝুলিয়ে রাখা, কিংবা তিনটুকরো করে লাশ বস্তাবন্দি করে রাখার খবর ফলাও করে প্রচারিত হলেও 'বাংলা ভাই' কিন্তু আজও গ্রেফতার হয় নি, অগ্রাহ্য হয়েছে খোদ প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশও। একটা সময় জোট সরকারের মন্ত্রী মতিউর রহমান নিজামী, এমপি মুফতি ফজলুল হক আমিনী বললেন - 'বাংলাভাই বলে কিছু নেই - এটা মিডিয়ার সৃষ্টি।' আবার চারদলীয় জোট নেতা মৌলানা মহিউদ্দিন আরো এক ডিগ্রী বাড়িয়ে বলতে থাকলেন : 'বাংলা ভাই ও শায়খ আবদুর রহমানেরা মহৎ কাজ করছে' (সাপ্তাহিক ২০০০, প্রচ্ছদ প্রতিবেদন, ২৫ নভেম্বর, ২০০৫)। তা এত যে 'মহৎ' মানুষ তাকে পুলিশ ধরবে কেন! সেজন্য দেখা গেছে আওয়ামী লীগের এক নেতাকে হত্যার অভিযোগে বাংলাভাইকে নাকি একবার গ্রেফতারও করা হয়েছিল, কিন্তু পুলিশ তাকে ছেড়ে দিয়েছিল উনি 'ইসলামী বুজুর্গ' বলে (সাপ্তাহিক মৃদুভাষণ, ২৯ আগাস্ট, ২০০৫)। বাংলাভাইকে ফিচার করে এলিজা গ্রিসওল্ড নিউইয়র্ক টাইমসে একটি প্রবন্ধ লিখলেন 'The Next Islamist Revolution' এ বছরের ২৭ এ জানুয়ারী। যথারীতি দেশের প্রবল প্রতাপশালী 'ইমেজ-রক্ষা-কর্‌ণেওয়ালারা' গ্রিসওল্ডের রিপোর্ট প্রত্যাখ্যান করলেন, আর দেশের ভাবমূর্তি একেবারে উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর করে দিলেন ছয়শ ওয়াটের বাল্ব জালিয়ে!

ইতিমধ্যেই উজ্জ্বল ভাবমূর্তির নমুনা হিসেবে প্রিন্সিপাল গোপাল কৃষ্ণ মুহুরী খুন হয়েছেন, ধরপাকর আর নির্যাতন চলেছে শাহরিয়ার কবীর, মুন্তাসীর মামুন, সালীম সামাদের উপর। বাংলা একাডেমীর বই মেলার সামনে চাপাতির আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত হয়েছেন বরেণ্য সাহিত্যিক ডঃ হুমায়ুন আজাদ। সময় সময় প্রাণ-নাশের হামলা হয়েছে বদরুদ্দোজা চৌধুরী, ডঃ কামাল হোসেন, সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত, ডঃ মহীউদ্দিন খান আলমগীর এবং মিস জেবুন্নেসার মতন ব্যক্তিত্বদের উপর। এলোপাথারি গুলিতে নিহত হয়েছেন আহসান উল্লাহ মাস্টার, মারা গেছেন হুমায়ুন কবির বালু। গ্রেনেড হামলা হয়েছে ব্রিটিশ হাই কমিশনার আনোয়ার চৌধুরীর উপর, মেয়র বদর উদ্দীন কামরানের গাড়িতে, ঢাকায় বঙ্গবন্ধু এভিনিউতে আওয়ামীলিগের সমাবেশে, বটেশ্বরে আর শেষ পর্যন্ত হবিগঞ্জে। এর মধ্যে আনোয়ার চৌধুরী প্রায় অলৌকিকভাবে রক্ষা পেলেও মৃত্যুকে এড়াতে পারেন নি আইভি রহমান কিংবা প্রাক্তন অর্থ মন্ত্রী শাহ এ এম এস কিবরিয়া।

কিবরিয়া হত্যাকান্ডের পর পরই আমি একটি ছোট প্রবন্ধ লিখি দৈনিক ভোরের কাগজে 'কিবরিয়ার মৃত্যুতে এক প্রবাসী বাঙালীর ভাবনা' শিরোনামে (ফেব্রুয়ারী ১১, ২০০৫)। সেখানে আমি নথিপত্র ঘেটে হিসেব দিয়েছিলাম : ১৯৯৯ সালে উদীচীর উপর হামলার পর থেকে কিবরিয়া হত্যাকান্ড পর্যন্ত ১৮ টি বড় সড় বোমা হামলায় মোট ১৪১ জন মারা গেছেন আর আহত হয়েছেন ১ হাজার ৮৩ জন। খোদ সিলেট বিভাগেই ঘটেছে আটটিরও বেশী গ্রেনেড আর বোমা হামলা। কিন্তু অবাক ব্যাপার হচ্ছে বোমা হামলা কিন্তু কখনওই ঘটেনি গোলাম আজমের গাড়ীতে, নিজামীর বাড়িতে, সাকা চৌধুরীর মেয়ের বিয়েতে কিংবা খালেদা জিয়ার কোন জনসভায়। সবগুলো হামলাই হয়েছে হয় পহেলা বৈশাখ (রমনা বটমূল), সিনেমা হল, যাত্রা, নাচ-গানের মত 'স্যেকুলার' (পড়ুন 'শরীয়ত-বিরোধী') অনুষ্ঠানে, নয়ত প্রগতিশীল

(পড়ুন 'কাফের', 'মুনাফেক' কিংবা 'ভারতীয় চর') ব্যক্তিত্ব কিংবা সংগঠনের উপর। ব্যাপারটা কি নিতান্তই কাকতালীয়?

কাকতালীয় যে নয় তা বোঝা গেল পরবর্তী ঘটনামালা বিশ্লেষণ করেই। এ বছরের ১৭ ই আগাস্ট বাংলাদেশের সবগুলো জেলায় এক নাগারে প্রায় ৫০০ টি বোমার মহড়া দেবার পর তাদের চোখ পড়ল স্বাধীন বাংলাদেশের 'বিচার ব্যবস্থা'র উপর। আক্রোশের শিকার হয়ে প্রথমে প্রাণ দিলেন শ্রী জগন্নাথ পাঁড়ে আর সোহেল আহমেদ চৌধুরী, দু'জন মাননীয় বিচারক। তারপর দিন কয়েকের মধ্যেই আধা ঘন্টার ব্যবধানে দুই আত্মঘাতি বোমা হামলায় প্রাণ হারালেন গাজীপুর আর চট্টগ্রাম আদালতে তেরো জন। ছা-পোষা বিচারকদের উপর জঙ্গিদের এতটা আক্রোশ কেন - এ নিয়ে তত্ত্ব আউড়ে মাথার চুল ছিঁড়তেই পারেন পোড় খাওয়া 'রাজনৈতিক বিশ্লেষক'রা। তবে আমার কমনসেন্স বলে, ঠিক যে কারণে রমনা বটমূলকে আর সিনেমা হলকে 'বে-শরিয়তী' জায়গা মনে করে, ঠিক সে করণেই আদালত পাড়াকেও বে-ইসলামী মনে করে তারা। তারা তো বাংলাদেশের স্বাধীন বিচার ব্যবস্থার বদলে মধ্যযুগীয় শরীয়া আইন বলবৎ করেতে চায়, চায় তালিবানদের মতন ইসলামী শাসনব্যবস্থা। যারা তালিবানী জঙ্গি শাসন চায়, তাদের কাছে তো স্বাধীন সেক্যুলার বিচার-ব্যবস্থার মাননীয় বিচারকেরা শত্রু হিসেবে গন্য হবেনই।

দেশের এ তালিবানী অবস্থা একদিনে গড়ে ওঠেনি। জঙ্গিবাদের চাষ হয়েছে অত্যন্ত সচেতনভাবেই - সব সরকারের আমলেই। আজ এটি বাম্পার ফলন দিচ্ছে। ইসলামী ঐক্যজোট নেতা শায়খুল হাদিস মওলানা আজিজুল হকের সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছিল সাপ্তাহিক ২০০০ এর পক্ষ থেকে ১৯৯৭ সালে। সেদিন তারা স্পষ্ট করেই বলেছিলেন, ইসলামী শাসন কায়েমের জন্য তারা সর্বাত্মক যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছেন। তালিবানরা তাদের আদর্শ। তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকার এ ব্যাপারটিতে মোটেও গুরুত্ব দেননি। সরকারের এই উদাসীনতার সুযোগ নিয়ে জঙ্গিবাদ সেই যে সূঁচ হয়ে ঢুকলো, আজ ফাল হয়ে বেরুচ্ছে। দৈনিক প্রথম আলোর ১৮ই অক্টোবর রিপোর্টে প্রকাশিত হয়েছে সম্প্রতি নিষিদ্ধ ঘোষিত হরকাতুল জিহাদের তত্ত্বাবধানে আশির দশকে বাংলাদেশ থেকে প্রায় তিন হাজার মাদ্রাসার ছাত্র-শিক্ষক জিহাদী জোশে উদ্বুদ্ধ হয়ে সোভিয়েত বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আফগানিস্তানে চলে গিয়েছিল। সে সময়ের সরকার কি তা জানতেন না? জানতেন, কিন্তু জেনেও আসলে না জানার ভান করেছেন। ১৯৯২ সালে পাকিস্তান আর আফগানিস্তানের যুদ্ধে অংশ নেওয়া হরকাতুল জিহাদের সদস্যরা দেশে ফিরে আসে আর দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। ১৯৯৬ সালের ১৯ এ ফেব্রুয়ারী হরকতুল জিহাদের ৪১ জঙ্গি অস্ত্র-সস্ত্র, গ্রেনেড সহ ধরা পড়ে কিন্তু সবাই উচ্চ আদালত থেকে জামিন নিয়ে পালিয়ে যায়। ১৯৯৮ সাল থেকে তারা উত্তরাঞ্চলের বিভিন্ন জেলায় সাংগঠনিক কাজ শুরু করে, গড়ে তুলে 'কিত্বাল বাহিনী' আর পরে 'জামাতুল মুজাহিদিন' নামের জঙ্গিবাহিনী; শুরু হয় সদস্য সংগ্রহ আর প্রশিক্ষণ দেওয়ার কাজ। সংগঠনের কেন্দ্রে থাকেন এক 'শায়খ' বা গুরু নামধারী এক আবদুর রহমান। তিনি কুখ্যাত বাংলা ভাইয়ের গুরু, এমনকি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবি বিভাগের অধ্যাপক আসাদুললাহ গালিবেরও গুরু। এই ডঃ গালিবের নেতৃত্বে আহলে হাদিস গোষ্ঠির একাংশ কীভাবে সহিংস ইসলামপন্থিতে রূপান্তরিত হয়েছে সে কাহিনীও বোধ হয় পত্র-পত্রিকার কল্যাণে এখন সকলের জানা। উত্তরাঞ্চলের ১৬ টি জেলা সহ খুলনা, কুষ্টিয়া, জামালপুর ও নারায়ণগঞ্জ এলাকায় গালিবের এই আহলে হাদিসের যুব সংগঠনের মাধ্যমে সন্ত্রাসবাদী দলগুলো দ্রুত বিস্তার লাভ করে। প্রথম আলোর অকটোবর ১৮, ২০০৫ সালের রিপোর্ট অনুযায়ী খোদ বাংলাদেশেই ২৯ টি কিংবা তারও বেশি জঙ্গী সঙ্গঠনের অস্তিত্ব রয়েছে (সাপ্তাহিক মৃদুভাষনের রিপোর্ট অনুযায়ী এই সংখ্যা ৭৭), তার মধ্যে উল্লেখযোগ্যগুলো হল : জামাতুল মুজাহিদিন, জাগ্রত মুসলিম জনতা, শাহাদাত-ই আল হিকমা, হরকাতুল জিহাদ আল ইসলামী, শহীদ নসুরুল্লাহ আল আরাফাত বিগ্রেড, হিজবুত তাওহিদ, জামায়াত-ই ইয়াহিয়া, আল তুরাত, আল হারাত আল ইসলামিয়া,

জামাতুল ফালাইয়া তাওহিদি জনতা, বিশ্ব ইসলামী ফ্রন্ট, জুম্মাতুল আল সাদাত, শাহাদাত-ই-নবুওয়ত, আল্লাহর দল, জইশে মোস্তফা বাংলাদেশ, আল জিহাদ বাংলাদেশ, ওয়ারত ইসলামিক ফ্রন্ট, জামায়াত-আস-সাদাত, আল খিদমত, হরকত-এ ইসলাম আল জিহাদ, হিজবুল্লাহ ইসলামী সমাজ, মুসলিম মিল্লাত শরিয়া কাউন্সিল, ওয়ার্লড ইসলামিক ফ্রন্ট ফর জিহাদ, জইশে মুহাম্মদ, তা আমীর উদদ্বীন বাংলাদেশ, হিজবুল মাহাদী, আল ইসলাম মার্টায়ারস্ বিগ্রেড ও তান্জীম। এছাড়াও বাংলাদেশ সরকার বিভিন্ন সময় নিষিদ্ধ করেছে চারটি আত্মস্বীকৃত ইসলামিক জঙ্গি সংগঠনকে; এগুলো হল : শাহাদাত ই আল হিকমা (২০০৪) জামাতুল মুজাহিদিন বাংলাদেশ (জে এম বি, ২০০৫), জাগ্রত মুসলিম জনতা বাংলাদেশ (জে এম জে বি, ২০০৫) এবং হরকাতুল জিহাদ (২০০৫)। প্রশ্ন উঠতেই পারে সরকার এতগুলো জঙ্গিগ্রুপের অস্তিত্ব জানার পর শুধু চারটিকে নিষিদ্ধ করেই তার দায়িত্ব শেষ করে দিতে চায় কেন?

মুক্ত-মনার লেখকেরা বহুবারই আরবীয় পেট্রোডলারে গড়ে ওঠা আর শিকর-বাকর গেড়ে বসা মাদ্রাসা শিক্ষার উপযোগিতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন। আদৌ কি আমাদের দেশের জন্য মাদ্রাসা শিক্ষার কোন প্রয়োজন আছে? নাকি এগুলো কেবল জিহাদী সন্ত্রাসী তৈরীর কারখানা? আমরা সত্যিই মনে করি আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থার সাথে সম্পর্কবিহীন ৬৮ হাজার রেজিস্টার্ড মাদ্রাসাগুলোর ভেতরে আসলে কি শেখানো-পড়ানো হয় তা খতিয়ে দেখা দরকার ছিল অনেক আগেই। কিন্তু সরকারের কর্নধরেরা তা করলেন না, তারা শুনলেন ইসলামিস্টদের কথা- যারা জোট সরকার ক্ষমতায় আসার আগেই পল্টনে স্লোগান তুলেছিলো - 'আমরা হব তালিবান, বাংলা হবে আফগান'। তারাই সরকারকে বাৎলে দিল সরকারের নীতি কি হবে - আলেম-ওলামাদের গায়ে হাত দেওয়া যাবে না। দাঁড়ি-টুপি ওয়ালাদের গায়ে হাত দেওয়া যাবে না। মাদ্রাসায় হাত দেওয়া যাবে না; বলে দেওয়া হল ধর যদি ধরতে হবে সেক্যুলার লোকজনদের। সরকারও তাদের কথামত রাষ্ট্রদ্রোহী বানিয়েছে শাহারিয়ার কবির, মুন্তাসির মামুনদের। প্রশিকাকে হেনস্থা করেছে, ই-টিভির উপর চড়াও হয়েছে, আর নজরদারী করেছে দেশের বাইরে কারা দেশের ইমেজ নষ্ট করছে; এমনকি ২১ এ আগাস্টে আওয়ামী লীগের সভায় গ্রেনেড হামলার পর আওয়ামী লীগারদের উপরেই দোষ চাপাতে চেয়েছে আর গ্রেফতার করেছে। অথচ কাওমী মাদ্রাসা বলে কথিত জঙ্গি তৈরীর কারখানাগুলোকে তারা বরাবরই রেখেছে নজরদারির বাইরে। কুয়েতি *রিভাইবেল অব ইসলামিক হেরিটেজ সোসাইটির* সাহায্যে ডঃ গালিব শিমূলতলী মাদ্রাসাকে কেন্দ্র করে কিভাবে সদস্য সংগ্রহ করেছিলেন সেটাও কারো অজানা নয়। এখন তো পত্রিকা থেকেই জানা গিয়েছে মাদ্রাসা তো বটেই প্রত্যন্ত অঞ্চলের মসজিদগুলোকেও জঙ্গি ট্রেনিং সেন্টার করে তোলা হয়েছে। একটা সময় খোদ আমেরিকাও কিন্তু এদের আগাছার মত বিস্তারে সহায়তা করেছিল, তাদের 'আদি শত্রু' কম্যুনিজম ঠেকানোর নামে। ব্যাপারটা স্পর্শকাতর হলেও সত্যি যে, মাদ্রাসাগুলোতে ধর্মগ্রন্থের যে অংশগুলোতে জিহাদের কথা আছে (২:২১৬, ২: ১৫৪), উদ্ভিন্নযৌবনা হুরীদের কথা আছে (৫২: ১৭-২০, ৪৪: ৫১-৫৫, ৫৬:২২), 'মুক্তা সদৃশ' গেলমান দের কথা আছে (৫২:২৪) সেগুলোর লোভ দেখিয়ে যুগ যুগ ধরে একপাল কর্মহীন বেকার যুবক তৈরী করা হয়েছে যারা স্বর্গের ৭২ টা হুর-পরীর আশায় নিজের বুকে বোমা বেঁধে আত্মাহূতি দিতেও আজ দ্বিধা করে না। আহত জঙ্গিদের মুখ থেকেই উঠে এসেছে তাদের মোটিভেশনের রহস্য। গাজীপুরের আত্মঘাতী হামলাকারী আহত রাজ্জাক পরিস্কার করেই বলেছেন যে বেহেস্তের টিকেট ধরিয়ে দিয়ে ইসলাম কায়েমের জন্য তাকে পাঠানো হয়েছে (আমাদের সময়, ডিসেম্বর ০২, ২০০৫)। ঝালকাঠির ঘটনার পর মামুন নামের বোমাবাজ যে তথ্য দিয়েছে তাতে স্পষ্ট যে দেশে বিপুল পরিমান সুইসাইড স্কোয়াডের অস্তিত্ব আছে। পত্র-পত্রিকার রিপোর্ট অনুযায়ী তা হতে পারে এমনকি দশ হাজার। ব্যাপারটা যদি সত্যি হয়ে থাকে বাংলাদেশ আক্ষরিক অর্থেই অ্যাটম বোমার উপর বাস করছে। জে.এম.বি তো ঘোষণা দিয়েছিলোই 'গানম্যান দিয়ে বিচারকদের বাঁচানো যাবে না'। ঠিক তাই হয়েছে গাজীপুর আর চট্টগ্রামে।

বহুবার বলা হয়েছে, বিষবৃক্ষকে বাঁচিয়ে রেখে গাছের আগায় কাঁচি চালিয়ে কোন লাভ নেই। হিন্দিতে তো একটা কথা আছেই - 'মরণেওয়ালাকো রুখতা কৌন', যে মরতে চায়, তাকে রুখবে কে? কাজেই স্বর্গের হুরী-অপ্সরার লোভে লালায়িত আত্মঘাতী জঙ্গিদের ফিলোসফির উৎসের দিকে আমাদের নজর দিতে হবে। সেজন্য কঠোর আইন প্রয়োগের পাশাপাশি যে সমস্ত অমানবিক শিক্ষা মাদ্রাসা পড়ুয়া ছাত্রদের মধ্যে অযথা হিংসা-বিদ্বেষ ছড়ানোতে বহুলাংশে দায়ী সেগুলোর দিকেও নজর দেওয়া আর তা বন্ধ করা দরকার খুব তাড়াতাড়িই। আধুনিক শিক্ষার বিস্তার, মুক্তবুদ্ধির চর্চা, অগনিত বেকার যুবকের অর্থনৈতিক-সংস্থান আর জীবন সম্পর্কে সঠিক দিক-নির্দেশনা দেওয়া ছাড়া অন্য কোন পথ সম্ভবত আমাদের সামনে এখন খোলা নেই।

অভিজিৎ রায়, ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অব সিঙ্গাপুরের গবেষক ফেলো, 'আলো হাতে চলিয়াছে আঁধারের যাত্রী' গ্রন্থের লেখক; ইমেইল : charbak_bd@yahoo.com